বঙ্গবন্ধু ও জুলিও কুরি শান্তি পদক

রিপন আহসান ঋতু

সময়টা মহামারির। মরণ ভাইরাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশ। এই অবস্থাতেও যুদ্ধ ও দখলের রক্তাক্ত ইতিহাস পৃথিবীকে ছেড়ে যায়নি। প্রতি পদে ঘুরে যাচ্ছে মৃত্যুর সার্চলাইট। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক উদ্বেগ এখন চরমে। পৃথিবীর মানুষ আজ একটি নতুন মানবিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রত্যাশা করছে কিন্তু কোনোভাবে মানুষকে আর মানবিক করে তোলা যাচ্ছে না। একবিংশ শতকের এই চরম উৎকর্ষের সময়েও তাই জুলিও কুরি শান্তি পদকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বব্যাপী অনুভূত হচ্ছে। মানুষের জীবন অতন্ত্য মূল্যবান। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনকে খুব মায়া করেন, ভালোবেসে থাকেন। একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুই ছিলেন ব্যতিক্রম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনকে সারাটা জীবনই তুচ্ছ করে গেছেন বাঙালি জাতির কল্যাণে। জাতির প্রতি তাঁর এ টান, মমতা ও ভালোবাসা তাঁকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ করে তুলেছিল।

গোটা বিশ্বে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি বিঘ্ন করার যেকোনো কার্যক্রমের বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যেখানেই মানবতার অবক্ষয় দেখেছেন সেখানেই তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, বিশ্ব বিবেককে জাগানোর চেষ্টা করেছেন এবং বিশ্বসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শান্তির জন্য এই ব্যাকুলতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক লক্ষ অর্জনের জন্যও তিনি শান্তিপূর্ণ পথেই অগ্রসর হয়েছেন সব সময়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কিন্তু তার হাতে ক্ষমতা না দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণা করে কুখ্যাত অপারেশন সার্চ লাইট বাস্তবায়ন শুরু করলো। পাকিস্তানি বর্বর আর্মি বাঙালিদের হত্যা করতে থাকে নির্বিচারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শুরু করেন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। ১লা মার্চ থেকেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রশাসন, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা সবকিছু চলছে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ব পরিস্থিতি, শান্তি, প্রগতি, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠন করেন। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংঘাতময় পরিস্থিতি উত্তরণে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জোড়ালো ভাবে।

এ সময় উপমহাদেশে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন ও উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা-চুক্তি ১৯৭১ এবং বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা-চুক্তি ১৯৭২, বাংলাদেশের মৈত্রী-সম্পর্কে এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে।

সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।’ এমন মানবিক, উদারচিত্তের নেতাকে বিশ্ববাসী গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে যখন চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অনন্য অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেটা আকস্মিক কোনো বিষয় ছিল না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক জুলিও কুরি ছিলেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের পুরোধা ব্যক্তি। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রবর্তিত পুরস্কার বঙ্গবন্ধুকে প্রদানের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন শান্তি পরিষদ মহাসচিব রমেশ চন্দ্র। অনুষ্ঠানে বিশ্বের নানা প্রান্তের শান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ২৩ই মে জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে পদক পরিয়ে দেওয়ার সময় রমেশ চন্দ্র বলেন, ‘শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, বিশ্ববন্ধুও।’

বঙ্গবন্ধুর জুলিও-কুরি শান্তি পদক অর্জন তাই আপামর বাঙালির এক বিরল সম্মান। এ মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে। কিন্তু এ প্রাপ্তি বা অর্জন দেশি-বিদেশি অনেকের কাছেই চোখের বালি বা ঈর্ষণীয় বিষয় ছিল। একটি ছোট্ট দেশ তাও অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ, এ গরিব মানুষের এত শান্তির দরকার কী? ধনী বিশ্বের আশা-আকাঙক্ষা হচ্ছে, গরিব মানুষদের শান্তি নিশ্চিত করা হলে তার নিজের সুখ শান্তির ঘাটতি হয়ে থাকে। তাই ধনী বিশ্বের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর ঈর্ষা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি। অথচ এ সম্মান পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, 'এ সম্মান কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনো প্রতিহিংসার রাজনীতি করেননি। ঘোরতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জন্যও ছিল তার বুক উজাড় করা ভালোবাসা। বাঙালির প্রিয় নেতা ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে ফিরেই পাকিস্তানি বর্বরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছ, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছ, অসংখ্য ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছ এবং আমার এক কোটি মানুষকে তাড়িয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এরপরও তোমাদের প্রতি আমি কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ করি না।' গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ সেদিন অবাক বিস্ময়ে শুনেছে জাতির পিতার সেই অমিয় বাণী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার, মানবিক এবং সংবেদনশীল একজন মানুষ।

ষোল বছর আগে বিবিসি বাংলার শ্রোতারা নির্বাচন করেছিলেন সর্বকালের সেরা বিশজন বাঙালিকে। সেই জরিপে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখন কারো কারো মধ্যে যে বিস্ময় দেখা দেয়নি, তা নয়। রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিজ্ঞান-সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সংস্কারের শত শত বছরের ইতিহাসে সব বাঙালিকে ছাড়িয়ে শেখ মুজিব কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তার উত্তর অত্যন্ত সহজ তিনি বাঙালির ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা। শেখ মুজিব একদিকে যেমন ইতিহাসের নায়ক, বরপুত্র আবার অন্যদিকে তিনি ইতিহাসস্রষ্টা। পুথিগতবিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, সৃজনশীলতায় তারচেয়ে সেরা বাঙালি হয়ত আরও এক বা একাধিক পাওয়া যাবে কিন্তু শেখ মুজিবের মতো অসম সাহসী, দূরদর্শী এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী এমন রাজনৈতিক নেতা বাঙালিদের মধ্যে আর একটাও নেই। তিনি জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করেছেন। যা বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের কাছে অনুকরণীয়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তিনি বিশ্ববন্ধু হিসেবে সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।

বর্তমান বিশ্বে আজকের এই দুঃসময়ে যখন করোনাভাইরাস মানবজাতির হাজার হাজার অর্জনকেই শুধু নয়, মানবঅস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হতে পারি। সবার জন্য স্বাস্থ্য এ স্লোগান ছিল বঙ্গবন্ধুর। আমরা দেখছি এই একই স্লোগানকে সামনে নিয়ে বিশ্ব শান্তি স্থাপনে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাবার দেখানো সেই পথেই হাঁটছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী শেখ হাসিনা দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যদিও সেটি বিদ্যমান স্থূল সমাজ বাস্তবতায় একরকম দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ইত্যমধ্যে বিশ্ব শান্তি স্থাপনে তাঁর অনন্য ভূমিকার প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশংসা করেছেন টনি ব্লেয়ার পর্যন্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং খ্যাতনামা সব প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে দিয়েছেন শান্তি পদক। বিশ্ব শান্তি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন একাধিক। নিজ দেশে পার্বত্য শান্তি চুক্তি, রোহিঙ্গা সমস্যায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় দৃঢ় অবস্থান, ভারতের সঙ্গে বড় বড় বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার কথা উঠেছে বারবার। পাননি হয়তো ক্লিনটন পরিবারের জন্য। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো নোবেল পুরস্কার পাননি কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী কোটি মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। সেটাও তো আমাদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার।

#

২৩.০৫.২০২১ পিআইডি ফিচার

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক